সুমন গুণ

চল্লিশের সচেতন প্রত্যাহার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাদা কথার মধ্যে যে বিত্ত ও ব্যঞ্জনা, তার সমারোহ সম্পর্কে বাংলাভাষায় আমাদের সবচেয়ে সফল ভাবে সচেতন করেছিলেন চল্লিশ দশকের কবিরা। কথার শরীরে বাইরে থেকে অলংকার না চাপিয়ে, তার ভেতরের দিকে সিঁড়ি তৈরি করে অনন্তের কাছাকাছি পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। বিশেষ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর কখনো কখনো অরুণ মিত্রের কবিতা আমাদের এই সূত্রে মনে পড়বে। গিনসবার্গকে এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কবিতা লেখার পরে কাটাকুটি করেন কতটা? তিনি অনেক বড় করেই উত্তর দিয়েছিলেন। সেখানে মূল কথা ছিল এই যে, কবিতা লেখার পরে সেই কবিতার কাছে আমি আবার ফিরে এসে দেখার চেষ্টা করি কোথায় কোথায় অতিসচেতন হয়ে উঠেছি। সেই অতিরিক্ত সচেতনতা মুছে দিলেই কবিতাটি যথাসাধ্য সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সাফল্য এখানেই যে, সচেতনতার এই প্রত্যাহারের জন্য তাঁদের চেষ্টা করতে হয়নি। তাদের কবিতা নিজগুণেই তা অর্জন করে নিত।

চল্লিশ দশকে সচেতনতার এই রসায়নের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। সারা পৃথিবীতেই সময় ও সমাজপ্রবণ কবিতার একটি সবল ধারা আছে। কখনও সরাসরি, কখনও অন্য নানা প্রবণতাকে আশ্রয় করে সময় আর সমাজের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের কথা দায়িত্বের সঙ্গে জানিয়ে দেবার ঝোঁকে রচিত হয়েছে বহু উজ্জ্বল কবিতা। বাংলায় এই ঝোঁক প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল চল্লিশ দশকে, যখন দেশে-বিদেশে তীব্র আর উদ্ধত অনেকগুলি ঘটনার ধাক্কা মুহুর্মুহু এসে পড়েছিল আমাদের মধ্যে। তার আগে বিষ্ণু দে প্রত্যক্ষভাবে আর তাঁর সতীর্থ কবিরা তুলনায় নিচু স্বরে, নিজেদের মতো করে চারপাশের ঝড়ের কথা ধরে রেখেছিলেন কবিতায়। জীবনানন্দের 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কথা বিশেষভাবে মনে পড়বে। অন্ধ হলে যে প্রলয় বন্ধ থাকে না, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সেকথা আমাদের খরতরভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তবে চল্লিশের দশকে এই আওয়াজ বাংলা কবিতার প্রধান ধরন হয়ে উঠল। যে সময়ে লেখালেখি শুরু করেছিলেন এই কবিরা,তার দহন থেকে আজও আমাদের ক্ষত তৈরি হয়। পুঁজ বেরোয়। দুর্গন্ধে ভরে ওঠে দেশ। সারা পৃথিবীতে অমানবিকতার উগ্রতা যেমন ছিল, পাশাপাশি তার সংঘবদ্ধ বিরোধিতার আন্তর্জাতিক এক জাগরণ শুরু হয়েছিল। যে কবিরা সেই আত্মঘাতী সময়ের মোকাবিলা করেছেন সরাসরি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, নিজেদের লেখায় প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে ধরে রেখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা, আমরা তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী, একথা আমার বারবার মনে হয়। সুকান্ত

ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র সহ অনেকের লেখা প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ঘরানায় একটা সাম্য আছে। তাঁরা সকলেই একটি প্রগতিশীল দর্শনে বিশ্বাসী। 'প্রগতিশীল' আর 'দর্শন' শব্দদুটি কিন্তু আমি বড়ো অর্থে লিখেছি। মানুষের বেঁচে থাকা আরো সুন্দর হোক, সম্ভাবনাময় হোক— সরাসরি এই কথাটা তাঁরা বারবার বলতে চেয়েছেন। এই সময়, বিপরীতমুখী নানা আবর্তে খর ও চঞ্চল এই সময় কীভাবে ঘা দিচ্ছে মানুষকে, আহত মানুষ আবার কীভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে— তার কথা দিয়েই সাজানো তাঁদের কবিতা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ঘরানার একজন স্বয়ম্ভর কবি। ভাষায় প্রকাশ্য খরতা না রেখেও এক সহজাত দায়ববদ্ধতায় তাঁর কবিতা মগ্ন।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এক স্বগত আর অনুগত সচ্ছলতা।'তোমার আলোকবিন্দু, বিপরীতে আমার প্রচ্ছায়া।/পাশে-পাশে থাকা, তবু কাছে এলে সরে সরে-যাওয়া/বুঝি-বা বনের বুকছেঁড়া বননিঃশ্বাসের হাওয়া/সরে-সরে যাওয়া, চাওয়া... ছায়ার সন্ধান সাধে কায়া'। আমার মনে হয়, পরস্পরবিরোধী নানা মত এবং তাঁর অকাল প্রয়াণ সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতা সম্পর্কে এক ধ্রুপদি বিভ্রান্তি তৈরি করেছে বাঙালি পাঠকের মনে। তাঁর মতো ধারাবাহিকভাবে জনপ্রিয় কবি বাংলায় দু-তিনজনের বেশি নেই, আবার, তাঁকে কবি হিসেবে নিস্প্রভ মনে করেন এমন পাঠকও আছেন। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক চিঠিতে সমর সেনের অপ্রস্তুত প্রশ্ন ছিল : 'সুকান্ত কি মহাকবি? আমার কল্পনা ও বোধশক্তি এত কমে গিয়েছে যে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি না'। এই সচেতন অস্বচ্ছতার ঘোর আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। কিন্তু, এটা না মেনে উপায় নেই যে তিরিশের দশকের পরে রাজনীতিপ্রবণ বাংলা কবিতার উজ্জ্বলতম ধারাটি সুকান্তরই সৃষ্টি। যে-ধারাটি পরে আরও ধারালো হয়ে উঠল শঙ্খ ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, মল্লিকা সেনগুপ্ত,জয়দেব বসু সহ আরও অনেকের লেখায়।

অরুণ মিত্রর কবিতায় সরলতার ধরনটির মধ্যে একটু বন্ধুর অন্ধকার আছে, তার ভেতরের জিনিসপত্র পুরো ঠাহর করা যায় না, অনেকটাই অনুমান করে নিতে হয়। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ইশারা একবগগা, হয়তো আরও তীক্ষ্ণ আর ছিপছিপে। তাছাড়া তার পরিবহনও বেশি। সুমনের গান যেমন সময়কে অবধারিতভাবে ঠোঁটে ধরে রাখে খড়কুটোর মতো, যে-আকাশেই তার ওড়া থাকুক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতারও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'মাটিতে পা, হাত আকাশে' : 'মানুষকে ঘৃণা করি না আমি,/অন্যের বিত্ত কেড়ে নেবার ইচ্ছেও নেই আমার,/কিন্তু, মনে রাখুন, খিদে পেলে/আমার ওপর চেপে বসে আছে যে, আমি/তার মাংসই তো খাব'। যদিও, মায়াকভস্কি বা নেরুদার লেনিন বা স্ট্যালিনকে নিয়ে লেখা কবিতার মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও একমুখী কিছু

কবিতা আছে, কিন্তু সাধারণভাবে এই তিনজন কবিই স্মরণীয় হয়ে আছেন সাদা কথার সিঁড়ি বানিয়ে পাঠককে দিগন্তের দিকে পৌঁছে দেবার ক্ষমতার জন্য। মনে পড়ছে মারিও ভার্গাস লোসা এক সাক্ষাৎকারে নেরুদার উদ্দামতা নিয়ে উচ্ছ্বাস জানিয়েও তাঁর স্ট্যালিনপ্রীতিমুখর কবিতা নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রতিদিনের কথার মধ্যে যে বহুতল ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকে, তাতে কখনো একটু টোল খাইয়ে, কখনো অন্য কথার সামর্থ্য দিয়ে উসকে কবিতায় তুলে এনেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কখনো সাদা গদ্যে, কখনো ছন্দের টানে বলে গেছেন মোক্ষম সব কথা। আর অনেক সময়েই তাজা ব্যঙ্গ আর কৌতুক শনশন করে তাঁর ভাষায়। সেই ব্যঙ্গের ভাঁজে কখনো কষ্ট, কখনো রাগ, কখনো বা ব্যথা মেশানো। সাদা কথার অফুরন্ত সম্ভাবনার সবটুকু কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কবিতার বড়ো একটা অংশ রাজনীতির আঁচ প্রত্যক্ষভাবে ধারণ করে আছে। সরাসরি বলার মধ্যেও যে পরিকল্পিত একটা জোর থাকা জরুরি, তাঁর কবিতা পড়লে সেটা বোঝা যায়। প্রথম পাঠে মনে হতে পারে যে একেবারে ওপরের তল থেকে বলা হচ্ছে কথাটি, কিন্তু সচেতন পাঠকের কাছে নেপথ্যের সক্ষম অবলম্বনটি অগোচর থাকে না। এমন সরাসরি বলা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অনেক : 'আমার ভারতবর্ষ / পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের/যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমুতে পারে না/ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে;/কত রাজা আসে যায়, ইতিহাসে ঈর্ষা আর দ্বেষ/আকাশ বিষাক্ত করে...'। রাজা আসে আর রাজা যায় কিন্তু মানুষের নির্যাতনের কোনও শেষ নেই এই কথা তাঁর অন্য অনেক কবিতাতেও ইতিহাসসম্মত প্রকরণে বলা আছে : 'রাজা আসে যায় রাজা বদলায়/জামাকাপড়ের রং বদলায়/শুধু মুখোশের ঢং বদলায়/দিন বদলায় না'। দিন বদলের কামনা আর প্রার্থনা বাংলায় অনেক কবির লেখাতেই আমরা নানা ভাবে প্রকাশিত হতে দেখেছি, কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মুখর অথচ অনুভবময় ধরনে এই ভাবনা যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তার একটা বড়ো কারণ তিনি আপোষহীনভাবে বেপরোয়া ছিলেন, আবার কবিতার নিজস্ব রসায়নটিও তাঁর আয়ত্ত্বে ছিল। এটা খুব বড়ো ব্যাপার। সারা পৃথিবীতেই প্রত্যক্ষ ও সরাসরি কথা বলার এক আগ্নেয় ঐতিহ্য আছে। সহজ কথা সরাসরি বলার মধ্যে অনেক ঝুঁকি থাকে, হঠকারিতার সম্ভাবনা থাকে। কবিতায় সোজাসাপটা কথা বলা হলেই তাকে খাটো মনে করার কোনও কারণ নেই। সারা পৃথিবীতেই সহজে লক্ষ্যভেদী বহু কবিতা লেখা হয়েছে, বাংলায় আরও অনেকের সঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ধরনের কবিতাকে দাপটের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এত সহজে বলবার কথাটি জানাতে পারেন তিনি যে পাঠক মুহূর্তে আক্রান্ত হন, নানা জায়গা ঘুরে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত হতে হতে গন্তব্য পৌঁছতে হয় না। আমাদের সময়ের নানা বিপন্ন ও বিমূঢ় অবস্থার শরিক তিনি। তাঁকে ও তাঁর সময়ের কবিদের যে পীড়িত অভিজ্ঞতার

মধ্যে দিনযাপন করতে হয়েছে তাঁদের কবিতা সেই স্পর্শ এড়াতে পারেনি, এড়াতে চায়ওনি। কেনই বা চাইবে? কবি তো তাঁর সময়ের কাছে সহজাতভাবেই দায়বদ্ধ। সেই দায় কেউ স্বীকার করেন, কেউ করেন না। যাঁরা করেন না, তাঁদের কবিতাতেও সময়ের সঞ্চার থাকে, একটু গোপনে, কখনো বা ঈষৎ সঙ্কেতে। তাঁরা সময়ের উদাসীন রূপকার, তাঁদের কবিতাও ভাষাকে সামর্থ্য দেয়। যেকোনও ভাষা-সাহিত্যের শীর্ষবিন্দুগুলির বেশ কয়েকটি তাঁদেরও নির্মাণ। আর যে কবিরা সময়কে এগিয়ে এসে টেনে নেন, তাঁদের কবিতার সঙ্গে প্রচারিত সখ্য তৈরি করেন, তাঁরাও, নিজগুণেই, পাঠকের এবং শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম অর্জন করেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় ধরনের কবি। তাঁর সময় ও স্বদেশের সব তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তকে তিনি ধরেছেন তাঁর কবিতায়। ছড়ানো এক আহ্বান পাঠকের জন্য বিছিয়ে রাখেন তিনি। যেন সব সময় হাত বাড়িয়ে আছেন পাঠকের দিকে, পাঠককে নিয়েই তাঁর স্বচ্ছন্দ বৈঠক, পাঠক এলেই তাঁর সব আয়োজন সার্থক। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষার, নদী অরণ্য ভালোবাসায় রঙিন তার স্বদেশের অবধারিত সৈনিক। ঘৃণা, হিংসা আর অবমাননার মুহূর্তেও তিনি জীবনের কথা, ভালোবাসার কথা, ইতিহাসের ইতিবাচকতার কথা উচ্চারণ করতে পারেন। অক্টাভিও পাজ-এর ভাষায় বলা যায়, জীবন তাঁর কবিতায় সব প্রতিরোধের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সমার্থক হয়ে ওঠে। যে স্বাধীনতা পাখির পালকে, নারীর দৃষ্টিতে, পথের ধুলোয়। সচেতন মানুষের শুদ্ধতম উচ্চারণ তাঁর কবিতা, যা আমাদের বিশ্বভাষাকেও নতুনভাবে নির্মাণ করে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে-কোনও কবিতা প্রসঙ্গেই এই উচ্চারণ অবধারিত মনে হয় : 'গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে— এই না হলে শাসন? /ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বন্ধ গুলির মুখে/উড়িয়ে দেওয়া চাই। /দেশের মানুষ না খেয়ে দেয় ট্যাক্স, গুলি কিনতে, পুলিশ ভাড়া/ করতে, গুন্ডা পুষতে ফুরিয়ে যায় তাই'।

ব্যঙ্গ আর কৌতুকের পরিবহন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর মণিভূষণ ভট্টাচার্য বহু কবিতায়। রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত অসততার বিরুদ্ধে, ভন্ডামির বিরুদ্ধে, নস্টামির বিরুদ্ধে তাঁদের ক্রোধ অনেক সময় সরাসরি উচ্চারিত না হয়ে ব্যঙ্গ বা ধারালো কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছে। এর ফলে তার ধার বেড়ে গেছে আরও। আর যখন সেই ক্রোধ সরাসরি উচ্ছ্রিত হয়েছে, তার উত্তাপ হয়েছে অলঙ্ঘ্য। ক্রোধ কত পবিত্র হতে পারে, বাংলা কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য আর মণিভূষণ ভট্টাচার্য তা বারবার চিনিয়ে দিয়েছেন। 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান' বইয়ের 'দধীচি' কবিতায় জনৈক সরকারি আমলার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেভাবে গর্জে উঠেছিলেন এক আমূল বিপ্লবী, তা পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় :'কলম ছুঁড়ে দিয়ে ফর্মটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে সেক্রেটারির/মুখে উড়িয়ে দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন—/'স্কাউন্ড্রেল্স্, আমাকে এভাবে ইন্সালট করার মানে কী?/আমি প্রাক্তন বিপ্লবী

নই , এখনো বিপ্লবী'। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "খড়গ" কবিতায় অন্য গমকে ঝলসে উঠেছে এই ক্রোধ : "ঝলসে উঠুক তীব্র আলোর হীরা /তোর ভয়ঙ্কর ক্রোধ /যেন মহানিশায় আগুন হাতে মন্ত্রপাঠ! /ক্লীবের শোণিত অন্ধকারে জ্বলতে থাকে;/ মহাদেবের বুকের ওপর /শক্তি, রাখিস পা! পরিশুদ্ধ মানবতা/ প্রতিপদের ভোর হেসেছে কোথায় যেন, যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা—/ রক্ত, চন্দন, তোর খড়গ বলে। ব্যঙ্গ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, কখনো উদ্যত ও মুখর, কখনওবা তুলনায় করুণ, স্তব্ধ। তুমি কী ফোটাবে আফিমের ফুল কোলকাতা" কবিতায় এই স্তব্ধতার শিখা টের পাওয়া যায় : 'তুমি কী ফোটাবে আফিমের ফুল এই শীতে কোলকাতা? চারদিকে গভীর কুয়াশা! মানুষ দেখে না পথ ভোরবেলা; শুধু দুর্ঘটনা ঘটে যায়।' ...'ব্রাহ্মমুহূর্তে ছায়ার মতো কারা ছেড়ে গেছে ঘর? আমরা জেগে ঘুমিয়েছিলাম, কলকাতা। এখন এইমাত্র জানি, তারা কেউ ফেরেনি; শুধুই ভেসে আসে হরিধ্বনি, বহুদূর থেকে...'। আবার "এই জন্মভূমি" কবিতায় তীব্র ও শাণিত ভাষা পেয়েছে ব্যঙ্গ : 'ডজনখানেক কালো কুকুর /ওরাই এখন এই দুনিয়ার মোল্লা, পুরুত, মন্ত্রী, কোটাল, পুলিশ—/ ওদের যদি ট্যাক্সো দিতে ভুলিস।/ কোথায় বা তোর পিতা-মাতা, কোথায় বা তোর ঘর? /দেখিস না কি রাত্রি গভীর? চক্ষু বুজে ঘুমান এখন তোর পরমেশ্বর'!

কখনও কখনও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এতটাই সরাসরি, এতটাই প্রত্যক্ষ ও মুখোমুখি হয়ে উঠেছে যে পাঠক হিসেবে আমরা অনেক সময়ই শিহরিত হয়েছি, স্তম্ভিত হয়েছি। এত খাঁটি, এত একরোখা, এত ভানহীন কবিতা বাংলা ভাষায় এত দক্ষতার সঙ্গে তিরিশের পরে আর কেউ লিখতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি না। যেহেতু নিজে খাঁটি ছিলেন, ফলে নির্ভীক একটা ধরন তাঁর কবিতায় আগাগোড়া বজায় ছিল। কারও মন বুঝে কবিতা লেখার দরকার হয়নি তাঁর। কোনও দল, কোনও তন্ত্র, কোনও প্রতিষ্ঠান তাঁর আরাধ্য ছিল না। তাই তাঁর সময়ে অনেক মানুষের নাম কবিতায় সরাসরি ব্যবহার করেছেন তিনি, তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এটা পেরেছেন তিনি এইজন্যই যে তাঁর নিজের লুকোনোর কিছুই ছিল না। গোপন কোনো নজর ছিল না তাঁর। সারা জীবন ধরে অকপটে যা বলার তাই তিনি অবলীলায় বলতে পেরেছেন। এই মুহূর্তে এমন পবিত্র সামর্থ্য নিয়ে কবিতা লেখা আমাদের ভাষায় অকল্পনীয় একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছে। 'যাদের সঙ্গে তুমি পার্টি করো, কখনও কি করেছ জিজ্ঞাসা ...' কবিতাটির কথাই মনে করুন। কবিতাটির শিরোনামের নিচে লেখাই ছিল : 'গোলাম কুদ্দুস, কবি-কে'। সেই কবিতায় সতীর্থ এক কবিকে বেদনার সঙ্গে, আক্ষেপের সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে তিনি এমন কিছু প্রশ্ন করেছেন যা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কারোর ক্ষমতা ছিল না করার। "ছেলে গেছে বনে" যার, তাঁর কথাও বিতৃষ্ণার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তিনি এখানে, প্রশ্ন করেছেন: 'সেও কেন কৈকেয়ীর অধর্মে দিয়েছে তাঁর রাজমুকুট ছুঁড়ে?' কবিতাটি শেষ হয়েছে এই

ভয়ঙ্কর প্রতীকী উচ্চারণে : 'তোমার অনেক আগে এই দেশে বোবা হয়ে গিয়েছেন নজরুল ইসলাম'।

আমাদের ভাষায় আরো অনেকেই সময়ের স্পর্শ কবিতায় সাফল্যের সঙ্গে ধরে দিতে পেরেছেন। এই ধরনের লেখার একটা সাধারণ বিপদ আছে। বিষয়ের দাম এখানে অনেক বেশি। তাই, অনেক সময়, কী বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে কীভাবে বলা হচ্ছে তার দিকে খেয়াল থাকে না। সেটা কিছুটা পর্যন্ত মেনেও নেওয়া যায়। কারণ শেষ পর্যন্ত আমাদের বেঁচে থাকা, সবাইকে নিয়ে ভালভাবে এই গ্রহমুহূর্ত সম্মিলিত উদযাপনের চেয়ে মহত্তর প্রসঙ্গ আর কী হতে পারে! কিন্তু তবুও , কোনোভাবে, প্রসঙ্গের চেয়ে প্রসঙ্গান্তরের দিকেই যে আমাদের ঝোঁক বেশি, সেটা তো আমাদের শিল্পচর্চার ইতিহাসে বারবারই প্রমাণিত হয়েছে। তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন: 'এখনও রাত শেষ হয়নি;/ অন্ধকার এখনও তোমার বুকের ওপর /কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছ না। /মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ /এখনও বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে'— তখন এই দুটি সীমানা ঘোরতরভাবে মুছে যায়। এই সীমানা নষ্ট করার সামর্থ্য সব কবির থাকে না। বাংলায়, আমাদের সৌভাগ্য, চল্লিশের দশকের যে কবিরা সময়ের সমস্ত হিংস্রতা বুক পেতে কবিতায় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই এই মহতী সামর্থ্যটুকু ছিল। বাংলা কবিতার একটা নির্ভরযোগ্য অংশের ভর এখনও তাঁদেরই লেখা।

শেক্সপিয়ারের নাটক সম্পর্কে আলোচনায় বার্নার্ড শ একবার জানিয়েছিলেন যে, সাহিত্যের উৎকর্ষের এক নির্দিষ্ট সীমা আছে এবং সময় কখনও না কখনও সেই সীমা স্পর্শ করে। এখন, এই নির্ধারিত উৎকর্ষ বিন্দুটি কখন এবং কীভাবে টের পাওয়া যায় তা নিয়ে নানা স্তরে মতান্তর আছেই। আমি মনে করি, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতা এই শীর্ষ স্পর্শ করেছিল চল্লিশ দশকে আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই শীর্ষের এই অপ্রতিহত বৈদূর্য।